Issue cover not available

Vol. 17 | No. 1 | 1973

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঢাকাই রসিকতা

Volume	17
Issue	1
Year	1973
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	June 1, 1973
DOI	10.62328/sp.v17i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v17i1.6
Pages	145-154
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ঢাকাই রসিকতা

নীলিমা ইব্রাহিম

ঢাকার স্থানীয় অধিবাসীদের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত সরস রসিকতা সম্পর্কে সারা বাংলাদেশে নানা গালগল্প প্রচলিত আছে। সৈয়দ মুজতবা আলী এর কয়েকটি উল্লেখ ক'রে তাঁর ধূপছায়া গ্রন্থে একটি প্রবন্ধ রচনা ক'রেছিলেন এবং এদের মূল্য সম্পর্কে সে প্রবন্ধে কিছু মন্তব্যও করেছিলেন। কাল পরিক্রমায় যে শ্রেণীর ভেতর এই সহজ রসিকতা বোধটি ছিল তারাও দিন দিন ক্ষয় পেতে পেতে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। সুতরাং অনেক দিনের লালিত ইচ্ছা ছিল যথা সম্ভব এই রসিকতাগুলিকে লিখিত ভাবে ধরে রাখবার, দীর্ঘ দিন পর সেই প্রচেষ্টায় যত্নবান হয়েছি।

ভাষায় বা সাহিত্যে রস রসিকতা আমরা মুখ্যতঃ দু'টি রীতি বা ভঙ্গীতে প্রয়োগ ক'রে থাকি, একটি নিছক আনন্দ দান বা হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা যার ফলে মানুষ সমগ্র পরিবেশে একটি স্বচ্ছন্দ লঘু আমেজ উপভোগ করে এবং বক্তা ও শ্রোতার মনও সাময়িক ভাবে সংসারের ভাবনা চিন্তা মুক্ত হয়ে অনাবিল হাসির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে; অবশ্য এর আবেদন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু এর সাময়িক মূল্যও কম নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর হাস্যরসের সঙ্গে থাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচা। এখানে শ্রোতা হাসেন সত্যি কিন্তু কিছুটা উষ্ণ আঁখিজল মোচনের প্রস্তুতিও তাঁকে নিতে হয়। অনেক সময় হাসি আসবার পর শুধু দুঃখ বেদনা নয়, অপমান আত্মগ্লানিতেও মুখ কালো হয়ে ওঠে।

ঢাকার কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হাস্যরস প্রথম শ্রেণীর। এখানে বিদ্রূপের হুল বা কাঁটা নেই। বক্তা অতি স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করেন। শ্রোতা হেসে গড়িয়ে পড়ে। তারপর আর নেই। একে বেশীক্ষণ মনে ধরে রেখে চুল চেরা বিশ্লেষণ করে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হবার কোনও কারণ ঘটেনা।

ঢাকাই রসিকতার বড় বৈশিষ্ট্য এর প্রয়োগ বা ব্যবহার প্রথাগত নয়। অর্থাৎ প্রচলিত কিছু রস-রসিকতা যা উচ্চারণ করতেন এদের পিতৃ পিতামহ পুত্র পৌত্র তারই রোমান্থন করেছেন। ঢাকাই রসিকতা কিন্তু এর ব্যতিক্রম; আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিয়ে এরা প্রতিদিন নতুন নতুন রসিকতা সৃষ্টি করে চলেছে। সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেও এরা রসিকতা সৃষ্টি করে। যেমন আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিত্তকোষে পাথর অপসারণের জন্য তাঁকে লণ্ডন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, শেখ রোগমুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। জনতা বিমান বন্দরে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে গেছে। সেখানে এক ঢাকাইয়া মন্তব্য করলোঃ হায় হায় এংরাজ এইডা কি কাম করলো? এই দ্যাশের সবই তো লইয়া গেছে গা। ময়ূর সিংহাসন থিক্যা শুরু কইর‍্যা ঢাকাই মসলিন কিছুই থুইয়া যায় নাই। আছিল শ্যাকের প্যাটের মইধ্যে এক টুকরা দামী পাত্থর, তা বি হালারা নিজেগো দ্যাশে নিয়া বাইর কইর‍্যা লইলো, দেখছো কিমুন হারামী? [হায় হায় ইংরাজ এটা কি কাজ করলো। এ দেশের সবই তো নিয়ে গেছে, ময়ূর সিংহাসন থেকে সুরু করে ঢাকাই মসলিন পর্যন্ত কিছুই রেখে যায়নি। শেখের পেটের ভেতর এক টুকরা দামী পাথর ছিল তাও নিজেদের দেশে গিয়ে বের করে নিলো? দেখেছো কেমন হারামী (এটা একটা ঢাকাইয়া গালাগালি যা এরা সর্বত্র ব্যবহার করে, নেমক হারাম অর্থে)]

সুতরাং, আমি যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছি অর্থাৎ এরা প্রতি মুহূর্তে একটি নিজস্ব ভঙ্গীতে রসিকতা সৃষ্টি ক'রে চলেছে।

এদের রস রসিকতা সম্পর্কে জানতে হ'লে এ বিশেষ অধিবাসীদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে কিছু জানা দরকার, কারণ পরিবেশ মানুষের মানসিকতা গড়ে তোলে। আমরা প্রায় সর্বদাই মন্তব্য করিঃ বাঙ্গালী হাসতে জানেনা, জানে শুধু কাঁদতে, বাঙ্গালীর কাব্য সাহিত্য এই অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তের সৃষ্টি সুতরাং সেখানেও অশ্রুজল। এর কারণ বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা তার আর্থিক অভাব অনটন ইত্যাদি। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা থেকে সুরু ক'রে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালী

অভাবগ্রস্ত জাতি। ছেঁড়া কাপড় শেলাই করবার জন্যে প্রতিবেশীর কাছে ছুঁচ ধার করবার প্রয়োজন তার আজও শেষ হয়নি তাই মরমী, বাউল, বৈষ্ণব, মর্সিয়া সব গানেই ওই একই সুর ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

ঢাকার আদি অধিবাসীদের জীবন যাত্রা কিন্তু এই গতানুগতিকতা থেকে পৃথক, এদের ভেতর মোটামুটি ভাবে ব্যহ্যতঃ দুটি সামাজিক শ্রেণী আছে ব'লে এঁরা মনে করেন ঃ

(ক) কুট্টি
(খ) সুব্বাসী (সুখবাসী)

প্রথম শ্রেণী সম্পর্কে বলা হয় এঁরা গৃহস্থ শ্রেণী থেকে এসেছেন অর্থাৎ চাষাবাদ ছিল এঁদের পেশা, দ্বিতীয় শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা ছোট খাট ব্যবসা বা অল্পায়াসে জীবন ধারণ উপযোগী পেশা এঁরা পছন্দ করতেন। দু'সম্প্রদায়ের ভেতর যথেষ্ট পরিমাণে রেষারেষি বর্তমান ছিল। কুট্টিরা নিজেদের সৎ ও অভিজাত বলে মনে করতেন। শ্রমলব্ধ অর্থ উপার্জন এঁদের গর্বের কারণ। সুখবাসী, সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল নিম্নমানের। এরা বিলাসী, আরাম প্রিয়, অলস এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে অসাধু। তেমনি সুখবসীরা কুট্টিদের হেয়জ্ঞান করতেন। কুট্টিরা তাঁদের দৃষ্টিতে চাষী এবং শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে হ'ত, অতএব তাঁরা নিজেদের অভিজাত এবং সেকালের আমীর ওমরাহের বংশধর ব'লে মনে করতেন। এঁরা যথাসম্ভব পরস্পরের বৈবাহিক সম্পর্কও এড়িয়ে চলতেন। কুট্টিরা অনেক সময়ে সুখবাসীদের 'বাজাইরা' বা বাজারে নামে অভিহিত করে থাকেন, অর্থ এরা শহুরে এবং ওপরে বিলাসের চমক দেখান কিন্তু ভেতর অন্তঃসারশূন্য, উভয় শ্রেণীর লোকই এলাকা বিশেষে উর্দু কথা বলে থাকেন তবে তুলনায় কুট্টিরা অধিক সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষী।

মুখ্যতঃ চকবাজারকে কেন্দ্র করেই সুখবাসীদের বসবাস ছিল। সম্ভবতঃ একারণেই এদের বাজাইরা বলা হ'ত। চকবাজার, বেগম বাজার, ইসলাম পুর, বাবুর বাজার, উর্দু রোড, ইত্যাদি এলাকায় এঁরা থাকতেন। কুট্টি সম্প্রদায় ছিল ঢাকার শহরতলীতে, শহরের ভেতর দোলাই খালের উভয় তীরে সাধারণতঃ কুট্টিদের এলাকা ছিল। যেমন কলতা বাজার, রায় সাহেবের বাজার, গোয়ালঘাট,

নারিন্দা, সুরীটোলা, মইষুণ্ডি, সূত্রাপুর, বংশাল ইত্যাদি এলাকায় কুট্টিরা বসবাস করতেন। এই খাল দিয়ে তখন ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। বহু নৌকা বর্ষাকালে এ পথে যাতায়াত করতো এবং শহরের বিভিন্ন এলাকাতেও লোকে নৌকায় যাতায়াত করতো।

ঢাকা শহরের এই অধিবাসীরা একান্তভাবে সৌখীন। এদের পোষাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া, বিয়ে সাদীতে উৎসব একান্তভাবেই ব্যায়বহুল বিলাসিতাপূর্ণ। এখানে প্রচলিত আছে যে এরা সিনেমা দেখার পয়সা বাঁচিয়ে তবে খাবার পয়সা খরচ করে। দিনমজুর যে তাকেও সন্ধ্যাবেলা রীতিমত ভদ্র পোশাক পরে বিবি সঙ্গে নিয়ে সিনেমা যেতে দেখা যায়। নিম্ন বিত্তের বাড়িতে রাতে রান্নার বালাই থাকে না। দোকানের চা এবং রোস (টোষ্ট) খেয়ে হাসি ঠাট্টায় রাত কাটিয়ে দেয়। অসময়ে বাড়িতে জামাই এলেও দোকান বা হোটেল থেকে পোলাও কোর্মা এনে দেয়। সুতরাং বাড়ির মেয়েরাও যথেষ্ট আয়েসী। তবে মেহমানদারীর জন্য এরা বিখ্যাত, বাড়িতে অতিথি এলে এদের মত যত্ন করা আজকের দিনে দুর্লভ, এদের অপর বৈশিষ্ট্য জবান দিয়ে জবান রাখা। আজও এরা প্রতিশ্রুতি দিলে তা সহজে ভাঙ্গে না।

সহজ বিলাসী জীবন যাপনের জন্য এরা হাস্য মুখর জীবন যাপন করতে পারে। মনেহয় একারণেই তারা রসিক এবং কথায় কথায় এমন হাসির ফোয়ারা তুলতে পারে।

ঢাকাই ভাষায় রস রসিকতার জন্য মুখ্যতঃ কুট্টিরাই বিখ্যাত, এদের অনেকেরই পেশা ছিল পাল্কী ও ডুলী বাওয়া পরে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানী করা। কেউ কেউ আবার অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ীর মালিক ছিলেন এবং ভাড়াটে গাড়োয়ান রেখে ব্যবসা করতেন। বর্তমানে ঢাকা প্রায় ঘোড়ার গাড়ী শূন্য। কলিকাতা শহরে নানা যানবাহন থাকা সত্ত্বেও এখনও শিয়ালদা বা হাওড়া ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী দেখা যায় কিন্তু ঢাকায় এখন ঘোড়ার গাড়ী প্রায় চোখে পড়েনা বল্লেই চলে। এই গাড়োয়ান শ্রেণীর অনেকেই এখন পেশা হিসেবে রিক্সাচালক রূপে কাজ করে থাকেন। কিন্তু ক্রমশঃ সংখ্যা কমে আসছে। বিশেষতঃ লেখা পড়ার

দিকে ঝুঁকে এরা এখনি ডাক্তারী, ওকালতী, সরকারী চাকুরী অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকেন। অবশ্য দেশ বিভাগ পর্যন্ত ঢাকা শহরের ব্যবসা ক্ষেত্রে হিন্দু সাহা সম্প্রদায় ও ঢাকাই কুট্টিদেরই প্রাধান্য বেশী ছিল। এখানে আশ্চর্যভাবে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর ব্যবসা ছিল কম।

প্রথাগত ভাবে বহু রসিকতার গল্প প্রচলিত আছে। যেমন কোনও একজন সওয়ারী ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া নিয়ে তাতে চেপে চলেছেন। পথে বৃষ্টি এঁলো জীর্ণ গাড়ীর ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। যাত্রী বিরক্ত হয়ে বললো, এই গাড়োয়ান তোমার গাড়ীর ছাদ দিয়া পানি পড়ে ক্যান ?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো : চাইর আনা ভাড়ার গাড়ীর ছাদ দিয়া পানি পড়বো না কি সরবৎ পড়ব নাহি ?

এ রসিকতা ভাড়াটে বাড়ির ছাদ সম্পর্কেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

যাত্রী ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি করছে। কিছুতেই গাড়োয়ান রাজি হ'চ্ছে না। হঠাৎ চাপা কণ্ঠে বললো, 'সাব অস্তে কন্, পঙ্খীরাজে শুনবো : [আস্তে বলুন ঘোড়া শুনবে]।

যাত্রী : তোমার পঙ্খিরাজে শুন্‌লে কি অইবো ?

গাড়োয়ান : অইবো আর কি ? হাসবো।

বলাবাহুল্য ঢাকায় ঘোড়ায় গাড়ীর ভাড়া ছিল খুব সস্তা চার আনায় সদর ঘাট থেকে রমনা আসা যেতো। যাত্রী দু'আনা থেকে দর কষাকষি শুরু করেছে। নিরুপায় গাড়োয়ান গম্ভীর হয়ে বললো, 'ঠিক আছে দুই আনাই দিয়েন', লেকিন চাক্কার লগে যাইতে অইবো, যাইবার ভি পারবেন ঘুরবার ভি পারবেন।— অর্থাৎ চাকার সঙ্গে যেতে পারবেন ওই ভাড়ায় গাড়ীতে বসে যেতে পারবেন না।

অনেকদিন আগের কথা, মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিন আর কৃষক প্রজাপার্টির ফজলুল হক দু'জনের দাপটেই বাঙ্গালী মুসলমান অস্থির। জোড়া ঘোড়ার গাড়ী। হঠাৎ ঘোড়া খেপেছে। দুটো দু'মুখে যেতে চায়। যাত্রী প্রশ্ন করলো, কি হ'ল তোমার ? ঘোড়া এমন করে কেন ? তৎক্ষণাৎ উত্তর এলো। 'দ্যাহেন না

হালায় ফজলুল্ হক আর নাজিমুদ্দীন 'তুই হালায় দুইদিক চলছে।' আপনি না হেসে পারবেন না।

মুজতবা আলি ঢাকা রেসকোর্সের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একজন বাইরের লোক এক ঢাকাই কুট্টির পাল্লায় পড়েছে রেসের ময়দানে। ঢাকাই কুট্টি ঘোড়ার টিপ ধরে দিয়েছে। কিন্তু ঘোড়াবাজি জেতা দূরে থাক, সবার শেষে কোনও মতে গিয়ে পৌছুলো। জুয়ারী ক্ষেপে গেছে, মিঞা কিমুন ঘোড়ার টিকিট কিনলা ? একেরে হুগলতের পাছে ? মরা ঘোড়া নাহি ? উত্তর এলো, সাব ওই টুকই দ্যাখলেন বেবাক ঘোড়ারে যে খেদাইয়া লইয়া গেল হেইডা দ্যাখলেন না ?

জবাব এদের মুখে লেগেই আছে। এদেরই এক উপযুক্ত বংশধর এখন রিক্সা চালায়। এক ভর্দ্রলোক গুলিস্তান থেকে ডি, আই, টি, বিল্ডিংএ যেতে চান। রিক্সার সঙ্গে দরাদরি করছেন। ঢাকা শহরের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন এ দুটো জায়গা খুব কাছে, আগে ভাড়া ছিল চার আনা এখন হয়ত আট আনা। রিক্সাওয়ালা বুঝে নিয়েছে সওয়ারী আনকোরা টাটকা জীব গ্রাম থেকে এসেছে। হেঁকে বসলো, 'না সাব একটাকা লাগবো।

পথচারী বল্লেন, 'সে কি কথা ? ওই তো ডি, আই, টি, বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। অতো ভাড়া চাও কেন ?'

গম্ভীর রিক্সাওয়ালা উত্তর করলো', এইডা কিমূন কথা কইলেন ? চান্দ ভি তো দেহন যায়, এক টাকায় যাইবার পারবেন নি ? পথচারীর অবস্থা বুঝতেই পারেন, হেসে রিক্সায় উঠলেন।

আমার এক সহকর্মী অধ্যাপক একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হাসছেন, কারণ জিজ্ঞেস করাতে বল্লেন এক ঢাকাই রিক্সাওয়ালার পাল্লায় পড়েছিলাম। ব'ল্লাম তারপর ? উত্তরে বল্লেন, তারপর এক অপমানজনক ঘটনা ঘটে গেছে। কাহিনী শুনলাম ভদ্রলোকের পেছন পেছন অপর একটি রিক্সায় একটি রূপসী কন্যা আসছিলেন। ভদ্রলোক পেছনে ফিরে বারবার মেয়েটিকে দেখছেন। কিন্তু অধ্যাপক মানুষ, বিবেক চোখ রাঙ্গাচ্ছে, কাজটা ভালো হচ্ছে না। হঠাৎ

তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, রিক্সাওয়ালাকে বল্লেন, 'এই একটু থাম, বড্ড হাওয়া সিগারেট ধরিয়ে নি', ইচ্ছা কন্যা সামনে দিয়ে গেলে একটু ভাল ক'রে দেখবেন। সত্যিই মেয়েটি সামনে দিয়ে পার হ'য়ে গেল। ভদ্রলোক সিগারেট হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখছেন। হঠাৎ রিক্সাওয়ালা বলে উঠলো, 'সার হাওয়া তো গ্যাছে গা এ্যালা চালাই [স্যার হাওয়া চলে গেছে, এবারে চালাই]। ভদ্রলোক এমন জব্দ হয়েও কিন্তু এই রসিকতার কথা আমাদের সবার কাছে গল্প না করে পারলেন না।

এক লম্বা ভদ্রলোক গেছেন ফলের দোকানে ফল কিনতে, বলাবাহুল্য ঢাকার ইসলামপুর বা নবাবপুর এবং সদরঘাটের ফল বিক্রেতারা প্রায় সবাই ছিল আগে ঢাকার কুট্টি সম্প্রদায়ের। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন: লেবুর হালি কতো? [ঢাকায় সব জিনিস ডজন বা কুড়ি নয়, ৪ টায় হালি বলা হয়, সেই হালি হিসাবে বিক্রী হয়]

লেবুওয়ালা: এক টাকা

ক্রেতা: বলিস কিরে এতোটুকু লেবুর হালি এক টাকা?

লেবুওয়ালা: লেবু ছোট্ট নাহি? ভালা কইর‍্যা দেহেন।

ক্রেতা: দেখেছি ভাল করে, ছোট নয়ত কি?

লেবুওয়ালা: না সাব আপনেরে দোষ দিমু না, দূরের থনে বেবাক জিনিসই ছোট দেহা যায় [দূরে থেকে সব জিনিসই ছোট দেখায়]
বলাবাহুল্য ভদ্রলোক লম্বা। ক্রেতা এখানে বিরক্ত হ'তে পারে না। হেসে তাকে জিনিস কিনতে হয়।

ঢাকাই কুট্টির রসিকতার একটা মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য এরা কখনও অশ্লীল কথা বলে রসিকতা করে না। এদের রসিকতা মস্তিষ্ক প্রসূত, সুতরাং বুদ্ধিজীবীরা এ রস গ্রহণে অধিক আনন্দিত হন। অশিক্ষিত সমাজে স্থূল রুচি বহির্ভূত এ রসিকতা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

অনুরূপভাবে একভদ্রলোক আম কিনতে গেছেন। দামে বনছে না, তিনি বারবার এটা বেশী পাকা, ওটা পচা এটা কাঁচা—এই সব মন্তব্য করছেন।

দোকানদার পাশের ফলওয়ালাকে বলছে, আম বাছাই করবা নি মিঞা।

উত্তরে : হঠাৎ বাছাই করণের কতা কও ক্যান মিঞা ?

দোকানদার : না, না আমের দাক্তর (ডাক্তার) আইছে কি না হ্যার লাইগ্যা কই। ক্রেতার অবস্থা বুঝতেই পারছেন।

কুট্টি রসিকতার বেশীর ভাগ গল্পই কিন্তু বিকিকিনি নিয়ে। ফলে অনুমান করা যায় যে এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট বড় ব্যবসায়ী ছিলেন বা এখনও আছেন।

এক ভদ্রলোক গেছেন কাপড়ের দোকানে কোট কিনতে, ক্রেতা সৌখীন আলপাকার কোট চান। দর দস্তুর চলেছে, দোকানদার বুঝেছে কোট কিনবার সঙ্গতি এঁর নেই, অথবা লোকটি কৃপণ নাছোড়বান্দা দাম কমাবেই। ভদ্রলোক একটু রোমশ। হঠাৎ দোকানদারের চোখ সেদিকে পড়েছে, তখন হেসে বিনীত ভাবে বললো 'সার ক্যান খামাখা এতোগুলান ট্যাকা নষ্ট করবেন ? আলপাকা তো আপনের সারা গর্তে'ই আছে [শরীরে আছে]। গোটাতাক বুতাম কিনা লট্‌কাইয়া লন তাইলেই অইবো।' কোট কিনবার সখ এর পরও ভদ্রলোকের ছিল কিনা জানি না।

আশ্চর্য ব্যাপার এরা কিন্তু অন্যদের বলে বাঙ্গাল। ঢাকায় আসবার আগে জানতাম ভাগীরথী তীরের লোকেরা পদ্মা পাড়ের লোকদের বলে বাঙ্গাল। এখানে হরহামেশা ওদের মুখে বাঙ্গাল কথাটা উচ্চারিত হ'তে শুনে বিস্ময় বোধ করলাম। পরে জানলাম পল্লী গ্রামের লোককে এরা বাঙ্গাল বলে, এমন কি নারায়ণগঞ্জ থেকে লোক এলেও কৃপার হাসি হেসে বলে, নারায়ণগঞ্জের বাঙ্গাল।'

গরীব এক ভদ্রলোক গেছেন পাখা কিনতে, অনেক দরদাম করে দু'পয়সা দিয়ে একখানা তালপাতার পাখা কিনেছেন, দু'দিন পর বিক্রেতার কাছে ফিরে গেছেন, 'মিঞা কি পাখা দিছো ? গায় বাতাস লাগে না।

বিক্রেতা গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো : পাঙ্খা লইছিলেন কতো দিয়া ?

উত্তর এলো : কেন দু'পয়সা।

বিক্রেতা : বাঙ্গাল নাহি আপনে, শহরে থাকেন এক আনার পাঙ্খা আর দুই পয়সার পাঙ্খার বাসাতের ফারাগ জানেন না, কেমনে বাতাস খাইছিলেন ?

ভদ্রলোক সাধারণ লোকে যেভাবে পাখায় হওয়া খায় তেমনি করেই হাওয়া ক'রে দেখালেন।

বিক্রেতা : বুজঝি, হালায় দুই পয়সার পাঙ্খায় পাখা হিলাইতে হয় না, মাথা মুখ হিলাইতে হয়। চাইর পয়সার পাঙ্খা লইয়া যান। পাঙ্খা হিলাইয়া বাসাত্ খাইবেন।

ক্রেতা অবাক, আশে পাশের লোক হেসে অস্থির।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি সমকালীন ঘটনার ওপর এরা সুন্দর রসিক মন্তব্য করে থাকে। বাংলা দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বে সর্বত্র শ্লোগান দেওয়া হ'তো 'বাঙ্গালী জাগো, বাঙ্গালী জাগো', দেশ স্বাধীন হ'ল। অর্থনৈতিক একটা বিপর্যয় এলো, চুরি বাটপাড়ি। রাহাজানিও কিছু কিছু হতে সুরু করলো। এক ঢাকাইয়া মন্তব্য করছে, 'হ, শ্যাক সাবে তো খুব কইলো বাংগালী জাগো, বাংগালী জাগো, হালায় ইমুন জাগাই জাগছে রাইতে ভি ঘুম আহেনা।' [এমন জাগাই জেগেছে যে রাতেও ঘুমোয় না] এ সব মন্তব্য শুনলে আপনি শুধু হাসবেন না এদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখলে বিস্মিত হবেন।

আগেই উল্লেখ করেছি ঢাকাই কুট্টিরা বেশ সৌখীন। গান বাজনা করা, থিয়েটার সিনেমা দেখায় এদের যথেষ্ট ঝোঁক আছে। বিভাগপূর্ব ঢাকায় দু'টি সাধারণ নাট্যশালা ছিল। একটি পারসী থিয়েটার অপরটি বর্তমানের লায়ন সিনেমা যাকে স্থানীয় লোক বলতো : 'কাদিরার লাটক ঘর'। এ ছাড়া সৌখীন মঞ্চ ও নাট্য সংস্থাও ছিল অনেক। প্রায়ই আর কিছু না হ'লে পাড়ায় পাড়ায় সন্ধ্যের পর কাওয়ালী গানের আসর বসতো এবং প্রায় সারারাত এ গান চলতো। এ প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত ঢাকাই রসিকতার গল্প প্রচলিত আছে : এক ভদ্রলোক মুরগী কিনতে গেছেন, ভাল মুরগী পাচ্ছেন না। মুরগী আধমরা ঝিমুচ্ছে। ক্রেতা অস্বীকার করলেন ঝিমুনো মুরগী নিতে। মুরগীওয়ালা হঁা হাতে মুরগীটাকে উঁচু করে বল্লো : আবে হালা, তরে না কাওয়ালী শুনতে না করছিলাম। সারা রাইত গান হুইনা অহন ঝিমাইত্যাছো ?' ক্রেতা ততোক্ষণে কেটে পড়েছে।

ক'লকাতায় মেছুনীদের নিয়ে অনেক রসের গল্প আছে যেমন তাগা দেখিয়ে বা আংটি দেখিয়ে অথবা নথ দুলিয়ে মাছ দেখান। মুখ্য উদ্দেশ্য মাছ দেখানো

নয় তার অলঙ্কার প্রদর্শন। কুট্টি সম্প্রদায়ের ভেতর কিছু শিকারী আছে। এরা বাজারে মাছ বিক্রী করে। স্থানীয় লোক যারা নিয়মিত বাজারে আসে তাদের রুচি এবং ক্রয় ক্ষমতা এদের জানা আছে। কউকে চাচা কউকে মামা সম্বোধন করে মাছ গছিয়ে দেয়। অপরিচিত লোক দেখলেই কৌতুক করবার ইচ্ছা এদের প্রবল হয়ে ওঠে।

এমনিই এক ভদ্রলোক বাজারে এসেছেন। খুব বড় বড় কই মাছ দেখে তাঁর খুব কিনবার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু দাম শুনে কিছুটা দমে গেছেন। জেলের সামনে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ করতেও পারেন না। সুতরাং একটা অজুহাত দেখবার জন্যে বল্লেন, 'না: এ মাছ নেবো না; কেমন যেনো মরা মরা মনে হ'চ্ছে।

জেলে, 'মরা মরা মনে অইত্যাছে। থাক সাব, নিয়েন না, হুদা আপনের ঠিকানা গা দিয়া যান!'

ভদ্রলোক বিস্মিত, আমার ঠিকানা? ঠিকানা দিয়ে কি করবে?

জেলে: না, কইলেন কিনা মাছ গুলান মরা মরা। তাই কাগজে আপনের ঠিকানা লিখ্যা অগো গলায় লট্‌কাইয়া দিমু। আপনেই হাইট্যা আপনের মোকামে গিয়া উঠ্‌বো।

বলুন একারে ক্রেতা ভদ্রলোক কোন্ পথে যাবেন। এই উপস্থিত বুদ্ধি এদের রসিকতার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় এদের স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রাও বাধাগ্রস্ত, এদের অনেকেই আজ ঘোড়া আর গাড়ী হারিয়ে রিকসা চালায় অথবা রাজমিস্ত্রী, বাবুর্চি, বেয়ারা ইত্যাদির কাজ করে। অর্থ নৈতিক চাপে আজ মুখে প্রয়োজনের ভাষা থাকলেও রসিকতা করবার আগ্রহ ও উদ্যম প্রায় অন্তর্হিত। তবুও স্বভাব সুলভ আনন্দ উপভোগের চেতনা নিয়ে কখনও কখনও পথে ঘাটে দু'একটা মন্তব্য শোনা যায়। তবে আজকাল সে মুহূর্ত দুর্লভ।

এঁরা মিশে যাচ্ছেন জনতার সঙ্গে অথবা সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলা তেতলায় উঠে যাচ্ছেন। হয়ত আগামী দশ বছর পরে সভ্যতার আলোকে স্নাত হয়ে নিজেদের ভাষার বৈশিষ্ট্য ভুলে যাবেন অথবা ভুলতে প্রয়াসী হবেন।